★ উপনির্বাচনের খতিয়ান ও শিক্ষা ★

অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব কোলাহল বহন করে দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচন এসেছিল এবং সমাপ্ত হয়ে গেল। যদিও শতকরা পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনের মত লোক প্রকৃতপক্ষে ভোট দিয়েছে, তবু এই নির্বাচন দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। নির্বাচনের ফলাফল অস্পষ্টতার অবকাশ রাখেনি, প্রত্যাশাতীতও হয়নি। দঃ কলকাতার অধিবাসী দ্বিধাহীন ভাষায় কংগ্রেসী বেইমানীকে গলাধাক্কা দিয়ে বামপন্থী প্রার্থী সাধন গুপ্তকে জয়যুক্ত করেছেন; নিঃসংশয়ে বামপন্থাকে গ্রহণ করার মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা সারা দেশবাসীর অকুণ্ঠ ও আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করবেন। আমরাও কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করার জন্য তাঁদের সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করি শুধু নির্বাচনদ্বন্দ্বে নয়, পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার রক্ষক কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এবং এই ব্যবস্থাপ্রসূত নানা-প্রকার শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রত্যেকটি সংগ্রামে তাঁরা শ্রমিক কৃষকের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের সর্বত্রই জনগণ দেশ-দ্রোহী কংগ্রেসকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য বিপ্লবী আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হবেন।

আশা আশংকার হিসাব

নির্বাচনের প্রস্তুতি, প্রচার (ততোধিক অপপ্রচার) ও ভোটের লড়াইয়ের ফলে মাসাধিক কাল ধরে সর্বশ্রেণীর মানুষের মস্তিষ্ক ও স্নায়ু যেভাবে পীড়িত হয়েছে তাতে যুদ্ধবিরতির শেষে উপনির্বাচন প্রসংগে আপাততঃ ইতি টানাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয় হ'ত। কিন্তু ঘটনার জাল সে পথ রাখেনি। যেখানে প্রশ্নের মীমাংসা করার বদলে মূল প্রশ্নকেই চেপে যাওয়া হয়, জনতার দৃষ্টিকে মূল প্রশ্নের দিকে আকৃষ্ট না করে বিপথে পরিচালিত করা হয়, জটিল রাজনৈতিক আবহাওয়াকে পরিষ্কার করার নামে নানারকমের সুবিধাবাদী যুক্তির জাল বিস্তার করে চোখ বাঁধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়, বিশেষ করে সংগ্রামী জনতার মনকে যেখানে যুক্তিবিজ্ঞানকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে সহায়তা না করে ঠিক কংগ্রেসীদেরই পন্থায় (যে কৌশলে তারা বিগত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে জনসাধারণকে নিজেদের পেছনে টেনে এনেছিল) সরকারবিরোধী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে গতানুগতিক ভাবাবেগস্রোতে পা ভাসিয়ে দিতে শেখান হয়, সেখানে নীরবতা অপরাধ। তাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা অনেকের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করবে জেনেও জনসাধারণ, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার অধিবাসীদের সামনে তুলে ধরবার নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করছি। চিন্তাশীল সৎব্যক্তির কাছেই এইটুকু শুধু আশা করব যে অপ্রিয় হ'লেও আমাদের বক্তব্য বিষয়গুলো তাঁরা একবার ভাল করে ভেবে দেখবেন, এবং কোথাও ভুল বা অযৌক্তিক বলে মনে হ'লে বন্ধুর মত মনোভাব নিয়ে আমাদের ভুল শোধরাতে সাহায্য করবেন। উত্তাপ ও উত্তেজনা কমে আসছে, আমাদের মতে বামপন্থীদের ও জনসাধারণের এবার সুস্থির ভাবে নিজেদের কার্যকলাপের আগাগোড়া একবার হিসাব-নিকাশ করা দরকার। কারণ, 'ব্যালট-বক্সের' রায় যেটুকু আশার আলো তুলে ধরেছে, আগাগোড়া উপনির্বাচনটাই তার হাজার গুণ আশংকা ও ক্ষতির বীজ বুনে গেছে বলেই আমাদের দৃঢ় অভিমত। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে না যে বামপন্থী দলগুলো চূড়ান্ত বিভ্রান্তি, সুবিধাবাদ ও আদর্শহীনতার পরিচয় দিয়েছেন, এ-কথাও আজ আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না যে জনসাধারণ তাঁদের কংগ্রেস বিরোধিতার অভিব্যক্তি হিসেবে বামপন্থী প্রার্থীকে সুস্পষ্টভাবে জয়যুক্ত করে অকৃত্রিম প্রশংসাভাজন হয়েও, ঠিক যে পদ্ধতিতে তাঁরা এই নির্বাচন দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করেছেন ও তাঁদের অংশ পালন করেছেন তাতে রাজনৈতিক সচেতনতার যথেষ্ট অভাবই পরিলক্ষিত হয়েছে। আমাদের এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, পুঁজিবাদী অর্থ-নৈতিক কাঠামোতে পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সরকারপক্ষের বিরুদ্ধে বিপ্লবী নীতিও কর্মসূচীর প্রশ্নকে মুখে না হ'লেও কার্যতঃ যারা এড়িয়ে চলে এমন যে কোন সরকার-বিরোধী তথা বামপন্থী দলকে তা সে যত বড় যে নামধারীই হোক না কেন, সমর্থন করার মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় থাকলেও তাকে বিপ্লবী সচেতনতা কোনক্রমেই বলা যায় না। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় শোষকশ্রেণী ও তাদের তল্পীবাহক সরকার নিজেই ভোটের মারফৎ তার বিরুদ্ধে রায় দেবার সুযোগ জনতাকে দিয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হ'চ্ছে জনসাধারণের বিপ্লব মুখী মনোভাবকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের খাতে প্রবাহিত করে বিপ্লবী সংগ্রামের পথে

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল,এ
সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৫ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা] শুক্রবার ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৩ [চারি পয়সা

নির্বাচনের তাৎপর্য বিচারে বিপ্লবী নীতি

বাধা সৃষ্টি করা। কাজেই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার-পক্ষ যেখানে জনতাকে বিপ্লবী চিন্তাধারা ও আন্দোলন থেকে দূরে রাখবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মোহে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করে, সেখানে জনতার সত্যিকারের বন্ধু বিপ্লবী দলের প্রধান কাজই হ'চ্ছে জনতাকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মোহ থেকে মুক্ত করা, সর্বপ্রকারের বাক-চাতুর্যের মুখোস খুলে ফেলে দ্বিধাহীন চিত্তে বিপ্লবের পথ ধরে এগোতে সাহায্য করা। কাজেই কোন দল, যদি সে শোষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক দল বলে নিজেকে প্রচার করে এবং যদি সেই দল বিপ্লবের প্রশ্নকে তত্ত্বগত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখতে চায়, তা হ'লে তাকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও শাসকবর্গের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিটি লড়াইয়ের—তা সে পার্লামেণ্টারী, পার্লামেণ্টারী-পদ্ধতি বহির্ভূত (extra-parliamentary), সামাজিক, অর্থনৈতিক, যে কোন লড়াই-ই হোক না কেন—লক্ষ্য একটিই। তা হ'চ্ছে, পুঁজিবাদী কংগ্রেস প্রতিক্রিয়া, তার আদর্শবাদ ও আনুসংগিক নানারকমের বুর্জোয়া fad, যা নিরন্তর জনমনে ঢুকিয়ে তাকে বিপ্লবের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা বুর্জোয়ারা করছে, এ সবকিছুকে নির্মূল করে জনতার মনকে তার প্রভাব থেকে উত্তরোত্তর মুক্ত করা; সেই সংগে, অন্য দিকে, তাদের বিপ্লবী মতাদর্শ, চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার অপরিহার্যতা উপলব্ধি করান, তাদের বিপ্লবী সচেতনতা ও দৃষ্টিভংগীকে সংশয় বা বিভ্রান্তি কাটিয়ে আরো উন্নত পর্য্যায়ে উঠতে সাহায্য করা, সংগঠিত মনোভাব ও কর্মপ্রচেষ্টাকে দৃঢ়তর করা। এই-ই হ'চ্ছে বিপ্লবী দল কর্তৃক ছোট বা বড় খণ্ড বা ব্যাপক যে-কোন লড়াই যে-কোন আন্দোলনের লাভ-লোকসান হিসাবের মাপকাঠি। এই-দাবীগুলো যদি পালিত হয়ে থাকে এবং সেই সংগে রাজনৈতিক সচেতন জনতার সক্রিয়, conscious এবং organised combatability যদি উন্নততর হয়ে থাকে, তাহ'লেই আন্দোলনের সফলতা। এই দিকটিকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোন ভাবে যদি দলের কিছু লাভ হয়ে থাকে, তাকে বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগ্রামী জনতার লাভ হিসেবে গণ্য করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। উপরিউক্ত এই বিষয়গুলোরই স্বাভাবিক পরিপূরক হিসেবে এই কথাটাও সংগে সংগে মনে রাখতে হবে যে, জনসাধারণ শুধু রাজনৈতিক দলের লেজুর হবেন না, তাঁদের মিলিত বিচার-বুদ্ধি ও সংগঠিত শক্তি প্রয়োগ করে দলগুলোকে তাঁদের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য করবেন। এই আলোতে বিচার করলেই দেখা যাবে যে দক্ষিণ কলকাতার অধিবাসী যদিও বামপন্থী প্রার্থীকে সুস্পষ্টভাবে জয়যুক্ত করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক বিচার, সিদ্ধান্ত বা কর্মপ্রচেষ্টার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারেন নি। এই সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা প্রশ্নগুলো তুলে ধরছি; এই আশায় যে দল মত নির্বিশেষে রাজনৈতিক কর্মীরা ও জনসাধারণ আত্মবিশ্লেষণের মনোভাব নিয়ে সেগুলো বিচার বিবেচনা করে দেখবেন, সমাধানের পথ খুঁজবেন।

উপনির্বাচনে বামপন্থীদের কাছে জনসাধারণ আশা করেছিলেন—আর জনসাধারণের কাছেও বামপন্থীদের কর্তব্য

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষক সমাজ লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ

দাবী আদায় না হইলে অবিরাম ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ঘোষণা

পশ্চিম বাংলার চির-নির্য্যাতিত শিক্ষকসমাজ আজ এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। যুগ যুগ ধরিয়া যে শিক্ষক সমাজ শিক্ষার আলোক বর্ত্তিকা হাসিমুখে বহন করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের উপর গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়াই আসিয়াছেন, যাঁহারা সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ, তাঁহারা আজ মৃত্যুপথযাত্রী। সমস্ত প্রকার দৈন্য, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের জ্বালা যন্ত্রণাকে বিনা অজুহাতে সহ্য করার মহান আদর্শই ছিল যাঁহাদের হাতিয়ার, আজ তাঁহারা সহ্যের সীমা হারাইয়াছেন। "Plain living and high thinking" এর প্রশ্নও আজ অবান্তর, যেহেতু আজ অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রশ্নই সরাসরি দেখা দিয়াছে।

শিক্ষক সমাজের এই দুর্দ্দশা শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত সম্পর্কহীন নহে। বৃটিশ প্রভুদের স্বার্থে পরিচালিত এতদিনকার ত্রুটিপূর্ণ, অপরিসর এবং সমগ্র জাতির স্বার্থের বিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থা ভারত সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও অন্ততঃ পাঁচ বছরের জন্য টিকিয়া থাকিবার ছাড়পত্র লাভ করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় শিক্ষার উন্নতির প্রয়োজনীয়তাকে শুধু মুখেই স্বীকার করা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা উক্ত পরিকল্পনায় কোন স্থান লাভ করে নাই।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা ও ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও সরকার এবিষয়ে বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্য বোধের পরিচয় দেয় নাই। এমনকি এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটি গঠনের যে প্রস্তাব নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, বিভিন্ন সংস্থা ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বহুবার করিয়াছেন, সে বিষয়েও সরকার এখন পর্য্যন্ত নির্বাক।

একথা অনস্বীকার্য্য যে শিক্ষার বাহন শিক্ষক সমাজ যদি অনাহার, অর্দ্ধাহারে দিন কাটান, স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনের কোন সুযোগই যদি তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত না থাকে, তাহা হইলে শিক্ষার প্রসারের যত চেষ্টাই হউক না কেন তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এখানে তথাকথিত আদর্শের প্রতি সরকারী কর্তৃপক্ষের তথাকথিত অনুরাগ বর্জন করিয়া বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করা একান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ গোটা ভারতবর্ষের শিক্ষক সমাজই অল্প বিস্তর এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের বা রাজ্য সরকারের সহিত পশ্চিম বাংলার অবস্থা তুলনা করিলে তাহা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির সহানুভূতির উদ্রেক করে। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতনের হার নিম্নে দেওয়া হইল :—

উড়িষ্যা— পূর্ব্ব পাঞ্জাব— উত্তর প্রদেশ— হায়দ্রাবাদ—পশ্চিম বঙ্গ

বি এ, বি টি, ১০০—২১০ ১৫০—২২০ ১২০—২০০ ১৮০—৩২৫ ৭৫—১৫০ ৩২৫—৪০০

প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে শিক্ষাখাতে অতি অল্প ব্যয় বরাদ্দই এই দুর্দ্দশার জন্য দায়ী। নিম্নের হিসাব হইতে উহা পরিষ্কার হইবে।

১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেট

	মোট রাজস্ব	শিক্ষাখাতে ব্যয়	শতকরা হিসাব
উত্তর প্রদেশ—	৫৫,৫৬,২০,৪১৫৲	৮,৫৪,৭৭,২০০৲	প্রায় ১৬ %
মধ্যপ্রদেশ—	২৫,০৬,২২,০০০৲	৪,২৬,৯২,০০০৲	,, ১৭ ,,
বিহার—	৩৩,০০,০০,০০০৲	৫,০৯,৮১,০০০৲	,, ১৪ ,,
পাঞ্জাব—	১৯,৭৩,৯১,০০০৲	২,৫২,২০,০০০৲	,, ১৩ ,,
উড়িষ্যা—	১৩,৫৬,৮৯,০০০৲	৪,৭৮,২৬,০০০৲	,, ১৩ ,,
পশ্চিম বাংলা-	৩৮,১৫,৮৭,০০০৲	৪,৫২,০৯,১০০৲	,, ১১ ,,
বোম্বাই—	৬১,৫৫,০০,০০০৲	১২,৮০,০০,০০০৲	,, ২১ ,,
মাদ্রাজ—	৭১,০৫,০০,০০০৲	১১,৯৫,০০,০০০৲	,, ১৭ ,,
মহীশূর—	১৪,১৭,০০,০০০৲	৩,০৯,০০,০০০৲	,, ২২ ,,
আসাম—	১০,৬২,০০,০০০৲	১,৭০,০০,০০০৲	,, ১৬ ,,

পশ্চিম বাংলা সরকারকে শিক্ষার উন্নতির কথা বলিলেই তাঁহারা অর্থাভাবের অজুহাত দেখান। শিক্ষার ব্যাপারে অর্থের যথেষ্ট অভাব হয়, কিন্তু পুলিশ বাজেটের ক্ষেত্রে অকারণ অর্থের অপব্যয় হইতেছে। যে পশ্চিম বাংলার রাজস্বের শতকরা ১১% ভাগ ব্যয় হয় শিক্ষাক্ষেত্রে, সেখানে পুলিশী বাজেটের বরাদ্দ শতকরা ১৬% ভাগ। অবশ্য একথা ঠিক এবং সরকার একথা পরিষ্কার জানে যে শিক্ষাখাতে এই অল্প ব্যয় বরাদ্দের ফলে শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষার সহিত জড়িত বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ ছাত্র ও অভিভাবক সমাজের মধ্যে বিক্ষোভের সম্ভাবনা আছে। সেই বিক্ষোভ যখন আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইবে তখন একমাত্র ভরসা স্থল হইতেছে পুলিশ। আর এই প্রয়োজনীয়তাকে সরকার অস্বীকার করে কি করিয়া? প্রকৃত পক্ষে জনমতকে উপেক্ষা ও পদদলিত করাই যে সরকারের নীতি সে সরকারের বাজেট পুলিশী বাজেট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

শুধু তাহাই নহে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের নিম্নতম বেতন সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার্য্যকরী করিতেছে না। যদিও বিভিন্ন দিক হইতে চিন্তা করিয়া প্রচুর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতনের হার অনেক কম করিয়া ধরিয়াছেন, তথাপি তাহাকে কার্য্যকরী করার ব্যাপারে এত কাল হরণের কি যুক্তি থাকিতে পারে?

একজন আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের জন্য—৭০৲ টাকা।

গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের জন্য—৮০৲ টাকা।

গ্র্যাজুয়েট ও বি, টি শিক্ষকের জন্য —১০০৲ টাকা।

এম, এ, এম, এস, সি, অথবা এম, এ, বি, টি শিক্ষকের জন্য— ১২৫৲ টাকা।

নিম্নতম বেতনের দাবী কি এতই অযৌক্তিক? কিন্তু তবুও কেন তাহাকে উপেক্ষা করা হইতেছে? মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ যে "স্কুল কোড" একবছর আগে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পশ্চিম বাংলা বিধান সভার অনুমোদন সাপেক্ষ। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদ হইতেছে যে শিক্ষকদের নিম্নতম বেতনের প্রস্তাবিত হারের ব্যয় বহন করিতে সরকার নাকি অসমর্থ—এবং সেই জন্যই উক্ত "স্কুল কোডকে" এখনও বিধান সভায় পেশ করা হয় নাই।

উপরের আলোচনা হইতে একটা বিষয় জনসাধারণ নিশ্চয়ই একমত হইবেন যে শিক্ষক সমাজ কোনরূপ রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এই দাবী করেন নাই। এই দাবী তাঁহাদের বাঁচার দাবী—বাংলাদেশের শিক্ষাকে টিঁকাইয়া রাখার দাবী। এই দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত প্রকার আবেদন নিবেদনই অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই দাবীর পিছনে ব্যাপক গণসমর্থন থাকা সত্ত্বেও ইহাকে কার্য্যকরী করা হয় নাই। এ অবস্থায় পশ্চিম বাংলা শিক্ষক সমাজের সামনে একটি পথই খোলা আছে—তাহা হইতেছে আন্দোলনের পথ। শোষণ মূলক সমাজে কোন ন্যায্য দাবীই যে আন্দোলনের পথ ব্যতীত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, ইতিহাসের এই মূল্যবান শিক্ষাকে আজ শিক্ষক সমাজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং দৃপ্তকণ্ঠে তাঁহারা দাবী করিয়াছেন যে ১৯৪৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এই সমস্ত দাবী পূরণ না করিলে সারা পশ্চিম বাংলার শিক্ষক সমাজ দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত শিক্ষাদান কার্য্য স্থগিত রাখিবেন বা অবিরাম ধর্ম্মঘটের পথে পা বাড়াইবেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির এই সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। সাথে সাথে জনসাধারণের প্রতিটি অংশের কাছে এই আবেদন যে, বাংলা দেশের শিক্ষাকে বাঁচাইতে হইলে এই দাবীর পিছনে তাঁহাদের সক্রিয় সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্যাপক গণসমর্থন-পুষ্ট পশ্চিমবাংলায় শিক্ষক সমাজ এই দাবীকে সমস্ত প্রকার সরকারী দাম্ভিকতা চূর্ণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে এবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তাঁহাদের জয় সুনিশ্চিত—জয় হইবেই হইবে।

পথেপ্রান্তরে দোকানদারদের জীবিকার সংগ্রাম

পথের-ধারে অল্প পুঁজিতে ছোট ছোট ছাউনির তলায় দোকান খুলে এক দল মানুষ আজকাল জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায় সারাদিন অপেক্ষা ক'রে। এই শত শত পূর্ববঙ্গীয় বাস্তুহারা দোকানদারের উপর তথাকথিত "হাইওয়ে অ্যাক্টের" সরকারী হামলা আজ নেমে এসেছে। এই সমস্ত দোকানদারদের গ্রেপ্তার, দোকান বন্ধ, উৎখাত এবং অযথা পুলিশী হয়রানি আজকাল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

সম্প্রতি দমদম ষ্টেশনের সংলগ্ন সদর রাস্তার অনেক ছোট দোকানদারকে গ্রেপ্তার ও জরিমানা করা হয়েছে, যার ফলে দমদম থেকে বরানগর, কামারহাটী ও কাঁকিনাড়া এলাকার দোকানদারদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত অল্প পুঁজির দোকানদারেরা আজ প্রতি জায়গায় আঞ্চলিক কমিটি গঠন ও সংগ্রামী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য এক সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার রক্ষার সংগ্রামের প্রস্তুতি সুরু করেছেন।

বিপ্লব-নীতিহীন নির্বাচন-দ্বন্দ্ব জনস্বার্থকে বলি দিচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ছিল—একটি জিনিষ। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত একজন বামপন্থী প্রার্থী দাঁড় করান ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী সংগ্রামের স্বাভাবিক প্রতীক হিসেবে, বিশেষতঃ বামপন্থী ঐক্যের আদর্শকে জনতার সামনে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে 'ঐক্য' বলতে আমরা নীতিহীন, শুধুমাত্র সীট নিয়ে ভাগাভাগির, বোঝাপড়া বুঝি না। একথা আমরা আগেও বহুবার বলেছি এবং আজও তাই মনে করি। 'বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য চাই' এই শ্লোগানটি যদি নিছক বাক-চাতুরী দ্বারা অন্যের চোখে ধূলো দিয়ে নিজেদের সংকীর্ণ অবৈপ্লবিক স্বার্থ-সিদ্ধির কৌশল না হয়, তাহলে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনসাধারণের বিচ্ছিন্ন সংগ্রামগুলোকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য এরা (বামপন্থী ঐক্যের) রাজনৈতিক গুরুত্ব বিপ্লবী দলের কাছে বর্তমানে সবচেয়ে বেশী। এই হিসেবে, বৃহত্তর বিপ্লবী সংগ্রামেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নির্বাচনকে বিচার করলে দ্বিতীয় অন্য কোন পন্থা গ্রাহ্য হ'তে পারে না। অথচ বামপন্থী ও বিপ্লবী বলে কথিত দলগুলো দঃ কলকাতা উপনির্বাচনে বামপন্থী ঐক্য সাধনে বিফল হ'ল কেন, জনসাধারণ স্বভাবতই প্রশ্ন করতে পারে; এবং আমাদেরও বক্তব্য এই দলগুলোর সাধারণ কর্মীদের কাছে রাখতে চাই—কী এমন নীতিগত পার্থক্যের জন্য বামপন্থী ঐক্য সফল হ'তে পারল না, ঐক্যবদ্ধ একজন বামপন্থী দাঁড় না করানর ব্যাপারে কোন নীতিগত প্রশ্ন ছিল কিনা, না, এটা নিছক দলীয় সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্তী হ'য়ে একের বিরুদ্ধে অপরের বিদ্বেষের অথবা রাজনৈতিক মূঢ়তা-জনিত দৃষ্টিভংগী ও মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি? সংশ্লিষ্ট দলগুলোকে বারবার প্রশ্ন করে উভয় পক্ষেরই কাছ থেকে একই জবাব এসেছে—তা হ'চ্ছে তাঁরা প্রত্যেকেই নাকি মূল নীতিগত প্রশ্নে কোন মীমাংসায় আসতে না পেরে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য হ'য়েছেন। বিপ্লবী বলে পরিচয় দিয়েও শুধুমাত্র ভোটযুদ্ধে জিতে পার্লামেন্টে একটি সীট দখল করার ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে এই দলগুলো যে কী রকম মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে, উপরোক্ত বক্তব্য থেকে তা অত্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যায়। আমরা যতটুকু জানি, প্রথম থেকেই সুস্থ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে সংশ্লিষ্ট কোন একটি দলও পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াস করেন নি। ভূপালবাবুর পক্ষ সমর্থনকারী দলগুলোর মনোভাব আমরা যতটা লক্ষ্য করেছি তাতে একথা নিসংশয়ে বলা চলে যে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি বিদ্বেষজনিত অন্ধ রাজনৈতিক মনোভাবের দরুণই তাঁরা এই উপনির্বাচনে তাদের সংগে ঐক্য গঠন করতে সক্ষম হন নি। গোড়ার থেকেই এই দলগুলোর মনোভাব ছিল, এই সীটে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থীর দাবীর যে যৌক্তিকতাই থাক না কেন, তাঁরা কোনক্রমেই এই সীটটি উক্ত পার্টিকে ছেড়ে দেবেন না। এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই সংশ্লিষ্ট দলগুলোর, বিশেষ করে কম্যুনিষ্ট পার্টির, কর্মীরা আমাদের করতে পারেন যে, ভূপালবাবুর সমর্থক দলগুলোর কার্যকলাপ সম্বন্ধে উপরিউক্ত অভিমত পোষণ করেও আমরা (সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার) কেন কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সমর্থন করি নি। তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে উপরিউক্ত দলগুলোর মনোভাব ও কার্যকলাপ যাই হোক না কেন বর্তমান নির্বাচনে বিপ্লবী দলের সামনে এমন কোন বৃহত্তর স্বার্থ ছিল না যার জন্য বহু কষ্টে অর্জিত বিভিন্ন আন্দোলনের মারফৎ বাংলাদেশে যতটুকু সীমাবদ্ধ বামপন্থী ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। কম্যুনিষ্ট পার্টি যেখানে নিজেকে ভারত বর্ষের শ্রমিক শ্রেণী ও শোষিত জনতার একমাত্র বিপ্লবী দল বলে মনে করে সেখানে কোন্ মূল নীতিগত প্রশ্ন ও রাজনৈতিক বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তারা যে-ঐক্য একটি সীটের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করলেই রক্ষা করা ও জনমনে সেই ঐক্যের প্রতি আস্থাকে দৃঢ় করা সম্ভব হত তা করে নি? সততার সংগে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে বোঝা কঠিন হবে না কেন কোন পক্ষের প্রার্থীকেই সমর্থন না করে, আমরা একটি মাত্র ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী প্রার্থী দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে উক্ত দলগুলোর ওপর চাপ দিয়ে মতৈক্যে আসতে বাধ্য করবার আহ্বান জানিয়েছিলাম।

উপনির্বাচনের সীমারেখা ও সম্ভাবনা কতখানি বিস্তৃত ছিল? সীট একটি একজন প্রার্থীই পার্লামেন্টে যাবে। সেই প্রার্থী পার্লামেন্টে গিয়ে কী পরিবর্তন আনবে, কোন্ খানে? গভর্ণমেন্ট, পার্লামেন্টারী আন্দোলন, বাইরের বিপ্লবী সংগ্রাম—কোনখানে আমূল পরিবর্তন বা প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা; মন্ত্রীসভার পতন হবেনা, নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হবে না, সমাজ ব্যবস্থারও কোন পরিবর্তনের প্রশ্ন নেই। এগুলো কোনটিই issue ছিলনা। Issue একটিই ছিল, একটি কেন্দ্রের নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে কংগ্রেস ও বামপন্থীদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা; কংগ্রেস সরকারের ক্রম বর্দ্ধমাণ জনবিরোধীতা ও শোষণের জবাব জনসাধারণ ও বামপন্থী শক্তিগুলো কীভাবে দেয়, সেটাই প্রমাণ হত। বলাবাহুল্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্তরিক ভাবে লড়লে এখানে বামপন্থী প্রার্থীই জিতবে; বিভিন্ন গণআন্দোলনের মধ্যদিয়ে যে ঐক্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে তা আরো দৃঢ় হতে পারত, জনসাধারণের মনে আত্মবিশ্বাস ও বামপন্থী ঐক্যে আস্থা আরো সবল হতে পারত।

পরিবর্তে বামপন্থীরা যে কীর্তি স্থাপন করলেন তার তুলনা মেলা ভার তাঁদের আচরণে এই কথাই যেন প্রতীয়মান হ'ল যে, তাঁদের স্ব-স্ব প্রার্থী জয়ী হতে না পারলে তাঁরা নিজেরা তথা বিপ্লবী আন্দোলন রসাতলে যাবে, তাই তাঁরা সর্বস্ব পণ করে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। দুই বামপন্থী প্রার্থীই পরাজিত হয়ে যদি কংগ্রেস জেতে তাতেও ক্ষতি নেই, এই মনোভাব নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। দলীয় স্বার্থ ও সংকীর্ণতাই বড় হয়ে উঠল; আর জেদ ও অন্তঃসারশূন্য প্রেষ্টিজও বজায় রাখতে হবে। আশ্চর্য্য কি, বামপন্থী ঐক্য যেটুকুবা দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় অনেক কষ্টে গড়ে উঠেছিল, চুলোয় গেল; বিপ্লবের প্রতি নিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক আদর্শবাদ ও সাধুতা অনেক আগেই পালিয়ে বেঁচেছে।

নিয়মতান্ত্রিক মোহে অন্ধ যে 'বিপ্লবীরা'

এঁরা সবাই বিপ্লবী—কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি, আর-সি-পি ইত্যাদি। প্রত্যেকেই তারস্বরে চীৎকার করে থাকেন, বিপ্লব ছাড়া সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, শোষণের প্রতিকার হবেনা; নির্বাচনে জিতে (উপনির্বাচন ত' কোন ছাড়) কিছু হবেনা, ইত্যাদি। তবে কার্য্যকালে দেখা হয় অনেক কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। বাগাড়ম্বর তখনও চলে, তবে বাস্তব ক্রিয়াকলাপ ঢাকতে পারেনা যে নির্বাচনী আসনই 'শ্যাম সমান' হয়ে দাঁড়িয়েছে। নইলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে বিপ্লবীদের আচরণ ত' এরকম হয় না। বিপ্লবীরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন নির্বাচন ও নিয়মতান্ত্রিকতার অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে দেবার জন্য; শোষিত জনতার ওপর শোষক শ্রেণীর সরকারের অত্যাচার সৃষ্টিকে আইন সভায় গিয়ে প্রতিরোধ করতে ও তার গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুযোগকে যথাসাধ্য রক্ষা করতে যাতে বিপ্লবী আন্দোলনের পথ রুদ্ধ না হয়; এক কথায় বাইরের বৃহত্তর বিপ্লবী সংগ্রামের অংগ হিসাবে পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে সরকারের সঙ্গে লড়াই করা। কাজেই এমন কিছুই যদি করা হয় যাতে জনতার মনে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি, নির্বাচনী পন্থার প্রতি কোন রকম মোহ সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝতে হবে মূল উদ্দেশ্য বানচাল হচ্ছে, বিপ্লবী প্রস্তুতি পশ্চাদপসরণ করছে। বিপ্লবী সংগ্রামের প্রাথমিক হাতিয়ার আজ বামপন্থী গণতান্ত্রিক ঐক্য। নির্বাচনে লড়তে গিয়ে যারা ঐ বামপন্থী ঐক্য জলাঞ্জলি দেয় একটি সীটের লোভ ছাড়তে না পেরে তারা নিজেদের অ-বিপ্লবী চরিত্র ত' প্রকাশ করেই, জনতাকেও ভাবতে শেখায় সীটের দ্বন্দ্বই আসল, ভোটে জিতে যেতে হয় তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। নিয়মতান্ত্রিকতার মোহ এই ভাবেই জনতার ঘাড়ে চেপে বসে। খাঁটি বিপ্লবী দল সংগ্রামী ঐক্যে ফাটল ধরতে না ধরে, জনতার বিপ্লবী চেতনা ও স্পৃহা যাতে আগে বাড়ে, তার জন্য প্রয়োজন হলে একটা কেন সব কটা সীট ছেড়ে দিতে প্রস্তুত থাকে; কারণ নিয়মতান্ত্রিকতার ভূত ঘাড়ে চেপে বসলে পরিণামে কীরকম ভুগতে হবে অন্যের না বুঝুক তারা পরিষ্কার বোঝে। তাই দায়িত্ব তাদের অনেকখানি। কাকবিপ্লবী সুবিধাবাদীদের এসব নীতির কোন বালাই থাকেনা, নির্বাচনের সময় তারা সীটের বখরা ও দ্বন্দ্ব ছাড়া সামনে এর বাইরে আর কিছু তখন দেখেনা—উপরন্তু উক্ত দলগুলো বারবার এই কথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ নির্বাচনে অনেক সীট ছিল, যে যার সংগে পেরেছে মিতালী করে বখরাবখরি করেছে; এবার সীট মোটে একটি,

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

উপনির্বাচনের শিক্ষা 'বিপ্লবী'দের চোখ খুলে দিক

তাই কামড়াকামড়ি নগ্নরূপ নিয়েছে—আধখানা বা সিকিখানা সীট নেবার উপায় থাকলে হয়ত মিটমাটের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা যখন নেই, তখন কয়েকটি দল একদিকে ও কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্যদিকে, উভয় অংশই 'বামপন্থী ঐক্য' ও 'গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি কর্ত্তব্যের' মন্ত্র উচ্চারণ করে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একপক্ষ দাবী করল, তারা কয়েকটি দল মিলে একজন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে, কাজেই দলের সংখ্যার দিক দিয়ে তাঁরাই বামপন্থী ঐক্যের নামান্তর। অন্য দল বলে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে তারাই বামপন্থী শিবিরের ধারক ও বাহক, অন্যদের কর্ত্তব্য তাদের সংগে সহযোগিতা করা, তা না করে তারা "কম্যুনিষ্ট-বিদ্বেষ" ও 'ভেদ-নীতি চালিত হয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরোধীতা' করছে মাত্র। বামপন্থী ঐক্যের প্রতি নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দু'দলই দেখিয়েছে সন্দেহ নেই; একমাস ধরে পার্কে, মাঠে, রাস্তায়, প্রাচীরগাত্রে নাগরিকরা তার অকাট্য প্রমাণ পেয়েছেন। কিন্তু মন তাঁদের আশান্বিত হতে পারেনি। উভয়পক্ষ যদি যুক্তিসঙ্গত মনোভাব নিয়ে আলাপ আলোচনা করে একজন প্রার্থীকে প্রত্যাহার করিয়ে অপরজনকে সকলের সম্মিলিত প্রার্থী হিসেবে সমর্থন জুগিয়ে নির্বাচন লড়ত, তাহলে বোধ করি বামপন্থী ঐক্য জোরদার বই আর কিছু হতনা, জনতার সামনে নতুন আশা, রাজনীতিক গগনে নতুন আলোর নির্দেশ মিলত। কম্যুনিষ্ট পার্টি ভূপাল বসুকে সমর্থন করলে নিজের জাত যেত না, অন্য পক্ষও সাধন গুপ্তকে সমর্থন করলে মাথা হেঁট হবার মত কিছু ছিলনা। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার দুই পক্ষের কাছেই এই উদ্দেশ্যে চেষ্টার ত্রুটী করেনি। কিন্তু অন্ধ-মনোভাব যেখানে চালকশক্তি যুক্তি সেখানে অচল। বাইরেও আমরা প্রচার চালিয়ে জনসাধারণের কাছে আবেদন করেছিলাম এই দুই দলের ওপর চাপ দিতে, দাবী জানাতে মীমাংসায় আসবার জন্য। তা ফলপ্রসূ হয়নি, দুর্ভাগ্য।

বামপন্থীরা ভেবে দেখুন

ভেবে দেখার দিন ফুরোয় নি, উক্ত দলগুলোর কাছে এখনও অনুরোধ করব তাঁদের দৃষ্টিভংগী বিচার করে দেখুন—হেরেই থাকুন বা জিতেই থাকুন, নীতিগত প্রশ্ন তাতে বদলে যায় না। তাঁদের কাজে বামপন্থী ঐক্যের কী হ'ল, জনমনে কী প্রভাব বিস্তার হ'ল, ভেবে দেখতে হবে। কয়েকটি দল একত্র মিলে নিজেদের মধ্যে একজন প্রার্থী দাঁড় করাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অপর পক্ষকে সে মনোনয়ন অনুমোদন করতে আহ্বান করলেই বামপন্থী ঐক্যের প্রতি দায়িত্ব পালন হয় না। হয়ত সংখ্যাধিক্যের জোরে নিজেদের প্রার্থীকে মনোনীত করা সহজ; একে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলে তৃপ্তিলাভ হতে পারে, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তির দাবী করতে পারেনা? বিরাগ ও বিদ্বেষকে মূলধন করে কর্তব্য সারা যায় না। কম্যুনিষ্ট পার্টির সুবিধাবাদ ও সংকীর্ণতাকে রুখতে তাঁরা বারবার ও দলকে বর্জন করার যে কৌশল অবলম্বন করে থাকেন তা অজ্ঞতাসঞ্জাত ও নিজেদের ওপর আস্থাহীনতা প্রসূত বই নয়, সে উদ্দেশ্য তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যেই শুধু সম্ভব। নিজেদের জেদ পরিত্যাগ করে যদি তাঁরা নিজেদের প্রার্থীকে সরিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ঐক্য গড়তেন, তাহলে তাঁরা প্রশংসাভাজনই হ'তেন—নিন্দা-বা বিদ্রুপ নয়।

কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছেও আমাদের বক্তব্য—বৃহত্তম বামপন্থী দল ব'লে দাবী বা অধিকার যতটা জন্মায়, দায়িত্ব ও কর্তব্য তার চেয়ে কম নয়, বিশেষ করে বামপন্থী ঐক্যের নেতৃত্ব দেবার মনোহর উদ্দেশ্য যেখানে ঘোষিত হয়ে থাকে। আপনারা নিজেদের আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্বের প্রতিনিধি বলে দাবী করে থাকেন। আমরা জানি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দল কম্যুনিষ্ট পার্টি সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, ঐক্যে নেতৃত্ব করে থাকে—আয়তনে যে সব সময়ে তারা বৃহত্তম তা নাও হতে পারে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী ও তার প্রতিভূ হিসেবে এই দলই যোগ্য নেতৃত্ব দেয়। আপনারাও নিজের জীবনকাহিনী পর্য্যালোচনা করে দেখুন ত্রিশ বছরে কয়টা আন্দোলনে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা অর্জন করছেন (তারও আগে দেখুন কয়টা আন্দোলনে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সংগে সামিল হতে পেরেছেন)।

এই উপ-নির্বাচনে আপনাদের আচরণ আর একবার এই যোগ্যতার প্রশ্নই তুলেছে। একটি সীটের চেয়ে বামপন্থী ঐক্য নিশ্চয়ই বড় যদি অবশ্য বামপন্থী ঐক্য নিছক একটা manoeuvre না হয়। বামপন্থী ঐক্যকে অটুট রাখবার, বিভেদ-নীতির হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নেতৃত্বকারী দলের নিঃসন্দেহে বেশী—আপনাদের দাবী অনুযায়ী আপনাদের। মেনে নিচ্ছি, অন্য দলগুলো অবিপ্লবী, সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি, এমন কি অবিমৃষ্যকারিতা হেতু বামপন্থী ঐক্যকে ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করেছে, সেখানে সাধারণ কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে না হ'ক অন্ততঃ নেতৃত্বকামী হিসেবে কি আপনারা একটি সীটের জন্য ঐক্য ভেঙ্গে যেতে দেবেন? সে ক্ষেত্রে আপনারা যদি সীটটি ছেড়ে দিয়ে অপর প্রার্থীকে (তিনিও বামপন্থী) বামপন্থী প্রার্থী হিসেবে আন্তরিকতার সংগেই আর সবার সংগে লড়তেন তা হ'লে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হত না। অথচ বামপন্থী ঐক্যের আদর্শ জনগণের সামনে উজ্জ্বল ও সার্থক হত, নিজেদেরও গৌরব বাড়ত, কমত না। আপনারাও সত্যি সত্যি তাদের মতই বামপন্থী ঐক্যকে ভেঙেচুরে বিসর্জন দিলেন। ঐক্যের খাতিরে এইটুকু ত্যাগ স্বীকার যারা করতে পারে না, তাদের অন্ততঃ ঐক্যের কথা উচ্চারণ না করাই ভাল। নির্বাচন ও নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি মোহ সৃষ্টি এর চেয়ে বেশী নগ্নভাবে আর কী করে বিপ্লবীরা" করতে পারে? এ ধরণের আচরণ পৃথিবীতে কোনও কম্যুনিষ্ট দল করে অথচ গণতান্ত্রিক নেতৃত্বও কায়েম করতে চায় বলে আমরা শুনিনি।

জনসাধারণের প্রতি হুঁসিয়ারী

জনসাধারণের জীবন নিয়ে রাজনীতিতে ছিনিমিনি খেলা হয়, জনসাধারণ সজাগ ও সচেতন না হ'লে এর প্রতিকার নেই। গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে সে প্রতিকার আসবে না। জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে সংগ্রামে না নামলে কোন দল কোনদিন মুক্তি এনে দিতে পারে না, আবার অন্ধভাবে ভাবাবেগ চালিত হয়ে রাজনীতিক দলের লেজুর বনে গেলেই মুক্তি আসবে না। দল জনতারই অগ্রগামী অংশ, জনতার আশা আকাংক্ষা যাতে দল রূপ দেয়ে তার জন্য জনতাকে সচেষ্ট হ'য়ে এগিয়ে আসতে হবে। তার জন্য জনতাকে হতে হবে সচেতন, সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ; যুক্তি-বিজ্ঞানকে আয়ত্ব করতে হবে; দল গুলোর কার্য্যকলাপকে যাচাই করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি জনস্বার্থকে যথোপযুক্ত রূপ দিতে না পারে বা তার পরিপন্থী কোন কাজ করে জনতাকে এগিয়ে এসে তার প্রতিবাদ করতে হবে, দলের ওপর চাপ দিয়ে তাদের ভুল শোধরাতে বাধ্য করতে হবে, অথবা অযোগ্য প্রমাণিত হ'লে পথ থেকে হটিয়ে দিতে হবে।

জনসাধারণের শক্তি ও সমর্থনেই রাজনৈতিক দলের শক্তি। কাজেই বিভিন্ন দলের চরিত্র ও ভূমিকা অনুধাবন করতে ভুল করলে জনতা শক্তি জোগাবেন ভ্রান্তপথকে ভ্রান্তশক্তিকে, ঠকতে হবে নিজেদের। দলের নাম ডাক আয়তন জৌলস দেখে যদি তার পেছনে ছোটা যায় তা হ'লে পরে অনুশোচনাই করতে হয়। চাক্ষুষ নিদর্শন রয়েছে বর্তমান কংগ্রেস রাজত্ব, এই পথে এগোলে ভবিষ্যতেও এরই অন্য সংস্করণ ঘটতে বাধ্য। কাজেই, নিজের প্রতি দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গেলে বিপ্লবী-নীতির বিচারে দল বিচার করে শক্তি জোগাতে হবে। বিপ্লবের কথা বলেও কার্য্যতঃ যদি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তাহ'লে সে দল যতই বড়ই হ'ক তাকে বর্জ্জন করতেই হবে, আর সঠিক বিপ্লবী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রমাণ হ'লে ছোট দলকেই শক্তি জুগিয়ে সংগ্রামের পথকে প্রশস্ত করতে হবে। অন্যথা বিপ্লবী সংগ্রাম কোনদিন সাফল্য অর্জ্জন করতে পারবে না।

দক্ষিণ কলকাতায় বামপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও হতাশার জন্ম হ'য়েছিল। কিন্তু তার প্রতিকারে এগিয়ে আসতে পারে নি জনতা যথেষ্ট সংঘবদ্ধতা ও সচেতনতার অভাবে। তাদের উচিত ছিল গণকমিটি গড়ে সভা করে, দলগুলোর কাছে ডেপুটেশন করে, স্থানীয় কর্মী ও প্রতিনিধিদের ঘেরাও করে বাধ্য করা মীমাংসায় আসতে, ঐক্যের ধ্বংসকে বন্ধ করতে। জনসাধারণের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখেও গোপন করে লাভ নেই জনসাধারণ কর্তব্যে যথোপযুক্ত সাড়া দিতে পারেন নি। অথচ দক্ষিণ কলকাতা সারা ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতায় অগ্রগণ্য নির্বাচক-কেন্দ্র বলে খ্যাত। এ থেকে শুধু আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের দুর্বলতাই সূচিত হয়। কিন্তু মানুষ ঠেকে শেখে; জনসাধারণও দীর্ঘকাল পরের ক্রীড়নক হয়ে থাকবেন না, তাঁরা অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে শত্রু মিত্র চিনে নিয়ে, নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে এগিয়ে যাবেন বিপ্লবের পথে, আমরা নিশ্চিত জানি।

বামপন্থী দলগুলোকেও, আবার বলছি, আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, বিচার করে দেখতে হবে নিজেদের ভূমিকা। কেউ হয়ত সংকীর্ণতা ও কম্যুনিষ্ট-বিদ্বেষ বশতঃ নিজেদের ও জনতার ক্ষতি করেছিলেন 'ডেমক্র্যাসির' ভড়ং দেখিয়ে; আর কম্যুনিষ্ট পার্টি এদের বিদ্বেষ ও "ষড়যন্ত্র" থেকে সুরু করে 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ' পর্য্যন্ত সব কিছুকে প্রতিপক্ষীয়দের বিরুদ্ধেই কুশলী হস্তে প্রয়োগ করে নির্বাচনী তরণীর পালে হাওয়া লাগিয়ে লক্ষ্যে পৌছেছেন, এই টুকুই তফাৎ। নির্বাচনের ফল যাই হয়ে থাক, বিপ্লব যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে, শ্রেণীসংগ্রাম যদি তার পথ হয়ে থাকে, অন্ততঃ তাহ'লে নিজেদের কারও স্বার্থ এগোয় নি, জনস্বার্থই গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—একথা অস্বীকার করবে কে?

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক ২৩, ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।